মহানবী (সঃ)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা (৬২৩-৬৩২ খ্রীঃ)*

ভূমিকা

রহ্‌মাতুল্লিল আ'লামীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুধুমাত্র একজন নবীই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও মহান রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ছিলেন ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয় সংস্থার পরিচালক [১]। তাঁর জীবন সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। গোত্র কলহে লিপ্ত যাযাবর ও মরুবাসী আরববাসীকে অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সংগঠনী ক্ষমতা ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমে একই সূত্রে গ্রথিত করে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে তিনি গোড়া পত্তন করেন একটি *'উম্মাহ্‌'* ভিত্তিক রাষ্ট্রের। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানুষে মানুষে সাম্য শুধুমাত্র আল্লাহর প্রভূত্বে। *শিরকের* সকল চিহ্ন মূলোৎপাটিত হয়েছিল সমাজের অংগন হতে। অবসান হয়েছিল মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্বের। মানুষ স্বাদ পেয়েছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার, ফিরে পেয়েছিল মানুষ হিসাবে বিকশিত হবার সকল মৌলিক অধিকার। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইন ও ন্যায়ের শাসন। শাসক পরিণত হয়েছিলেন জনগণের সেবকে। মানুষের নিরাপত্তা ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল রাষ্ট্র। সমাজে নারীরাও পেয়েছিলেন মর্যাদার আসন। রচিত হয়েছিল ক্রীতদাস ও দাসীদের মুক্তির সোপান। সমাজ হতে শোষণের হাতিয়ার **সুদ** উচ্ছেদ হয়ে তদস্থলে প্রবর্তিত হয়েছিল জনকল্যাণমুখী ***জাকাত*** ব্যবস্থা। ধনী ও দরিদ্রের আকাশ-কুসুম পার্থক্য হয়েছিল সংকুচিত। মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) স্বয়ং। মহান আল্লাহ্‌ *ওহীর* মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান অবতীর্ণ করতে থাকেন। আর মহানবী (সঃ) তাঁর সাথীদের সাথে *শুরা* বা পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সেইসব বিধি-বিধান কার্যকর করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল একটি সুন্দর প্রশাসনিক ব্যবস্থা [২]। ঐতিহাসিকদের মতে, মদীনার এই রাষ্ট্রটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম সাংবিধানিক সরকার এবং সর্বোত্তম জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। রসুল (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই এই রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটেছিল মদীনা শহর ছাড়িয়ে আরবের প্রায় ১৯ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে [৩]। রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে মহানবী (সঃ) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটি এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বক্ষ্যমান নিবন্ধে মহানবী (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহানবীর সময়কালীন আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

মহানবী (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র তথা এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইসলাম পূর্ব আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া প্রয়োজন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আল্লাহ্‌র দুই মহান নবী যীশু (হযরত ঈসা আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবীর আগমন ঘটেনি। ইসলামে এই সময়টাকে *আইয়ামে জাহেলিয়া* বা 'মূর্খতার যুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা ইসলামী 'জ্ঞান ও আলোর' যুগের বিপরীত। *জাহেলী* যুগে আরবরা দুই বৃহৎ অংশে বিভক্ত ছিল [৪]। প্রথম অংশ হচ্ছে মরুবাসী বেদুইন। মধ্য আরবে ছিল এদের বসবাস। এদের নির্দিষ্ট কোন বসতি ছিলনা। এরা তাদের উট, মেষ ও ঘোড়া চারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ খোঁজার উদ্দেশ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত। এদের জীবন যাপন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। এরা ছিল শক্তিশালী, উদ্যমী ও অতিথিপরায়ন। আরবদের অপর অংশটি আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত। যাযাবর বেদুইনদের তুলনায় এরা সভ্যতার দিক দিয়ে অনেকটা অগ্রসর ছিল। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিল এবং বৎসরে দু'বার বাণিজ্য সফর করত। বাণিজ্য সফরে তারা শীতের সময় ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরবে, আর গ্রীষ্মকালে প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার প্রধান শহর ও নগরসমূহে গমন করত [৫]।

সৌজন্যে ঃ *জার্নাল অব ইসলামিক এডুকেশন*, সংখ্যা-১ শীত ১৯৯৫। *নিবন্ধটি বাবর হোসাইন সিদ্দিকীর সাথে যৌথভাবে লিখিত।*

যাযাবর আরবরা পরিবার, গোত্র, দল ইত্যাদিতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক পরিবার, দল ও গোত্রের একজন প্রধান বা নেতা ছিল। পূর্বপুরুষদের নামানুসারে পরিবার ও গোত্রের নামকরণ করা হত। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুল করিম বলেন, "গোত্রের বন্ধনই ছিল আরবদের সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। গোত্রই তাদের সরকার এবং গোত্র প্রধানই ছিল তাদের সরকার প্রধান। এই সূত্রে গোত্রই ছিল সার্বভৌম এবং গোত্রের প্রতিই তাদের আনুগত্য থাকত। গোত্রের বাইরে একসাথে বসবাস করা আরবের সমসাময়িক অবস্থায় সম্ভব ছিলনা" [৬]। বয়স, ব্যক্তিত্ব , সততা, প্রজ্ঞা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে গোত্রীয় প্রধান নির্বাচিত হতেন। সুতরাং বেদুইনদের সামাজিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের মৌলিক ইউনিট ছিল গোত্র যার ভিত্তি ছিল রক্তের সম্পর্ক। এস.এ.কিউ.হোসাইনী (১৯৬৬)-এর মতে, সাধারণভাবে আরব এবং বিশেষভাবে বেদুইনরা আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রী ছিল। তারা দলীয় প্রধান নির্বাচনে অংশ নিত, কিন্তু "তার আরোপিত (স্বেচ্ছাচারী) শাসনের কাছে আত্মসমর্পন" করত না। দলীয় প্রধান সাধারণতঃ প্রবীণ ও জ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত কাউন্সিলের সম্মুখে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন। আগেই বলা হয়েছে যে, আরবদের জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। তাই তারা সরকার, প্রশাসন, অফিস ও অফিস কর্মকর্তা ইত্যাদির ব্যাপারে তেমন মনযোগী ছিলনা।

অন্যদিকে, শহরবাসী আরবদের নগর-রাষ্ট্র ভিত্তিক সরকারের অস্তিত্ব ছিল, ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি। সে সময়কার ঐতিহাসিকদের মতে, "মক্কার আদিবাসীদের একটি সিটি হল (ঈরুঃ ঐধষষ) ছিল যার নাম ছিল *দারুন নদ্ওয়া* (সম্মেলন কক্ষ)[৭]। নেতৃস্থানীয় ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দলের কার্যাবলী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার জন্য সেখানে মিলিত হতেন। এছাড়াও তাদের আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ ২১টি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন, যথাঃ ১) *নদ্ওয়া ; ২) মশওরা ; ৩) কিয়াদাহ্ ; ৪) সেদানা ; ৫) হিযাবা ; ৬) সেকায়া ; ৭) ইমারাতুল বাইত ; ৮) ইফাদা ; ৯) ইজাজাহ্ ; ১০) নসি ; ১১) কুব্বা ; ১২) আন্নাহ ; ১৩) রিফাদাহ ; ১৪) আমওয়ালে মাহ্জরা ; ১৫) ই'সার ; ১৬) এশনাক ; ১৭) হুকুমাহ্ ; ১৮) সেফারা ; ১৯) ইকাব ; ২০) বুয়া' ; এবং ২১) হিলওয়া নুন নফর* [৮]।

মক্কার অভিজাত পরিবারসমূহ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করত। এসবের মধ্যে ছিল পর্যটক ও হাজীদের সেবা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ। এসকল সেবামূলক কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য তারা মদীনার মধ্যদিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে কর আদায় করতেন।

মহানবী (সঃ) এই মরুবাসী বেদুইন ও শহরবাসী আরবদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও গোত্রীয় প্রথা অটুট রেখে একই *উম্মাহ্* বা জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত করে সূচনা করেছিলেন একটি এককেন্দ্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের।

মদীনা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি

মহানবী (সঃ) এর জীবন সাধনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত ছিল, মক্কা হতে মদীনায় *হিজরত*। এই *হিজরত* উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসকেই শুধু বদলে দেয়নি, ইসলামের বিকাশেও একটি বিশেষ পর্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যীশু খৃষ্টের মৃত্যুর ৬২২ বৎসর পর, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাঁর মাতৃভূমি মক্কানগরী ছেড়ে মদীনায় *হিজরত* করেন। তৎকালীন মদীনায় *মুহাজির* এবং *আনসার* ছাড়াও অনেক ইহুদী বসবাস করত। তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। সে সময়ে মদীনায় প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। যথাঃ ১) মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়; ২) বিদেশী ইহুদী সম্প্রদায় ; এবং ৩) নব দীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় [৯]। এদের কারো সাথে কারো আদর্শের কোন মিল ছিল না, বরং তার উপর ছিল দলগত হিংসা ও বিদ্বেষ। এ সকল বিভিন্ন গোত্র এবং ভিন্ন ধর্মের অনুসারী লোকদের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা স্থাপনের জন্য রসুল (সঃ) প্রাথমিকভাবে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা একখানি দলীলে লিপিবদ্ধ করা হয়। ওটাকেই *কিতাব-উর-রসুল* বা রসুল (সঃ) এর কিতাব বা দলীল বলা হয় [১০]। এই দলীলই ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ***মদীনা সনদ*** নামে পরিচিত। জবঁনবহ খব্বু এর মতে, এই মদীনা সনদের মধ্যেই নিহিত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ [১১]। এই সনদের মাধ্যমেই গোড়াপত্তন হয় ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার ভীত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী, একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় চারটি উপাদানের ঃ ১) একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখন্ড ; ২) একটি জনগোষ্ঠী ; ৩) সার্বভৌম সরকার ; এবং ৪) জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ। মহানবী (সঃ) এর *হিজরতের* সময় মদীনায় ভূখন্ড এবং জনগোষ্ঠী ছিল, কিন্তু কোন সরকার ছিলনা এবং জনগণের মধ্যে একাত্মবোধেরও অভাব ছিল। মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক এই *কিতাব* (সনদ) জারী করার ফলে, তাঁর নেতৃত্বাধীন একটি প্রাতিষ্ঠানিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এছাড়াও সনদের

শর্তানুযায়ী, মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী সবাই মিলে একই *উম্মাহ্* বা জাতিতে পরিণত হয়। এই *উম্মাহ্* শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে ছিলনা, ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারেও । এতে বুঝা যায় যে, এখানে *উম্মাহ্* শব্দটি নাগরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে, এই সনদের (সংবিধান) মাধ্যমে মদীনায় যে প্রাতিষ্ঠানিক সরকার ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে, মুহাম্মদ (সঃ) হয়েছিল সেই সরকারের প্রধান।

মহানবী (সঃ) কর্তৃক রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিক ভিত্তি

মহানবী (সঃ) কর্তৃক সপ্তম শতাব্দীতে **মদীনা সনদ** জাতীয় চুক্তির মাধ্যমে *উম্মাহ্* ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের ঘটনাকে কেউ কেউ ঐতিহাসিক প্রয়োজন বা সে সময়কার পরিস্থিতিজনিত উদ্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু এর পেছনে যে যৌক্তিক কারণ ও সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা পবিত্র *কুরআনের* বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট। রসুল (সঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে বিভিন্ন নবী ও রসূলদের মাধ্যমে প্রচারিত ইসলামকে মানবজাতির জন্য জীবন বিধান হিসাবে পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছেন *(আল-কুরআন,৮ঃ৫)।* মানুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড যথা- রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি আল্লাহ্র আনুগত্য তথা *শরীয়া* আইনের কাঠামোয় পরিচালনার জন্য ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে **ইসলামী রাষ্ট্র** অপরিহার্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নবী ও রসুলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন শুধু নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হেদায়েতের পথে আহ্বানের জন্য। তাঁরা কেউ কখনও নতুন সমাজ গঠন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হননি। কিন্তু হযরত (সঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বের সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য *রহ্মাতুল্লিল আ'লামীন* হিসাবে *(আল-কুরআন,৩৪ঃ২৮)*। পূর্বের নবীগণের দায়িত্ব ছিল শুধু মানুষকে সত্য, ন্যায় ও আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে আহবান জানানোর। এসকল সাধারণ বিষয় ছাড়াও মহানবী (সঃ)-কে বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল মানুষের মাঝে **ন্যায়বিচার** প্রতিষ্ঠার *(আল-কুরআন,৪২ঃ১৫)*; মানুষকে **সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান ও অসৎকর্ম প্রতিহত করার** *(আল-কুরআন,৩ ঃ ১১০)*; এবং মানুষকে অধীনস্থ রাখার সকল ধরণের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্র প্রভুত্বে **সবার জন্য সমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার** *(আল-কুরআন,৭ঃ ১৫৭; ১৭ঃ ৩৩; ৪ঃ ২৯; ৪৯ ঃ ১১-১৩)।*

সমাজে ন্যায়ে প্রতিষ্ঠা, সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্ম প্রতিহতকরণ এবং মানবমুক্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন সামাজিক কর্তৃত্বের, অর্থাৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্মী সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রদানের অধিকার। অতএব, আল্লাহ্র আনুগত্যের ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজে উপরোল্লিখিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন প্রক্রিয়ায় রসুল (সঃ) প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা । এ ছাড়াও কলেমার প্রথম উচ্চার "লা" শব্দের মাধ্যমে ঘোষিত সকল ধরণের কৃত্রিম কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ঘোষিত বিদ্রোহ এবং "ইল্লাল্লাহ্"-এর আনুগত্যে গঠিত জীবন ব্যবস্থার নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক সামরিক কাঠামো যা একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রেই সম্ভব।

মহানবী (সঃ)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা

হযরত (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। উক্ত রাষ্ট্রে ধর্মীয় আইনই রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। তবে মহানবী (সঃ) রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিক সাধারণের মতামতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতেন। । জরুরী পরিস্থিতিতে তিনি জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করতেন [১২]। হযরত (সঃ)-এর প্রশাসন ব্যবস্থার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সহজতা ও সরলতা। প্রাথমিক অবস্থায় স্থায়ী কোন অফিস বা নিয়মিত বেতনভূক কোন কর্মচারী ব্যবস্থা ছিলনা। সকল ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র ছিল মস্‌জিদ। এতে হযরত (সঃ) বসবাস করতেন, প্রার্থনা করতেন, উপদেশ প্রদান করতেন, সাক্ষাৎপ্রার্থী ও বিদেশী পর্যটকদের সাথে দেখা করতেন, সমাজের কার্যক্রম সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং সমসাময়িক রাজা, সম্রাট ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রেরণের জন্য পত্রাদি রচনা করতেন। তাই বলা যায়, তখন সম্পূর্ণ অর্থে না হলেও বিভাগীয় বা *দিওয়ানে'র* অনেক কার্যাবলী অনানুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদন করা হত [১৩]। নিম্নে মহানবী (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল।

আলোচনার সুবিধার্থে সম্পূর্ণ আলোচনাটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। 'ক' অংশে রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি। 'খ' তে তুলে ধরা হয়েছে মদীনা রাষ্ট্রের কর্মচারী ব্যবস্থাপনা। 'গ' অংশে আলোচিত হয়েছে

সরকারী রাজস্ব ব্যবস্থা। 'ঘ' তে বর্ণিত হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আর 'ঙ' তে আলোচনা করা হয়েছে প্রশাসনিক জবাবদিহি ব্যবস্থা ও মহানবী (সঃ)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ। সর্বশেষে, উপসংহার দেওয়া হয়েছে 'চ' অংশে।

ক. সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। পবিত্র *কোরানে* ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কারো আদেশ বা আধিপত্য নাই" [১৪]। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার অর্থ এই যে, যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পিত হবে তারা হবেন আল্লাহ্‌র আইনের অধীন। মূলতঃ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্যই যুগে যুগে রসুলগণের আগমন। মদীনা সনদ অনুযায়ী মদীনা রাষ্ট্রে মুহাম্মদ (সঃ) এর সার্বিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই কর্তৃত্ব সার্বভৌম আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই। বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বোদিন,[১৫] অষ্টিন [১৬] ও হব্‌স [১৭] সার্বভৌমত্বের বিষয়ে এজাতীয় মতই পোষণ করেছে। হব্‌স বলেন ঃ " The Ruler was above his own laws but under God's or under the law of nature" [১৮]। হযরত (সঃ)-এর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থনে হোসাইনীর মন্তব্য হচ্ছে ঃ " He regulated social relations, he raised armies and commanded them, he acquired territories and administered them" [১৯]। প্রকৃতপক্ষে, মদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌ই ছিলেন আইনত সার্বভৌম এবং মহানবী (সঃ) ছিলেন কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

খ. সরকারী কর্মচারী ব্যবস্থা

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরতের (সঃ) সময়ে কোন স্থায়ী ও বেতনভূক কর্মচারী প্রশাসন ছিলনা। তবে মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য হয়রত (সঃ) নিয়োজিত করেছিলেন তিন ধরণের সরকারী কর্মচারী, যথা ঃ ১) *আল-ওয়ালী* (গভর্ণর); ২) *আল-আমিল* (কর আদায়কারী); এবং ৩) *আল-কাজী* (বিচারক)। এভাবে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থায় কর্ম বিভাজন নীতির প্রবর্তন করেন (সারণী-১ ও ২)।

সারণী-১
মহানবী (সঃ) প্রবর্তিত মদীনা রাষ্ট্রের
প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ

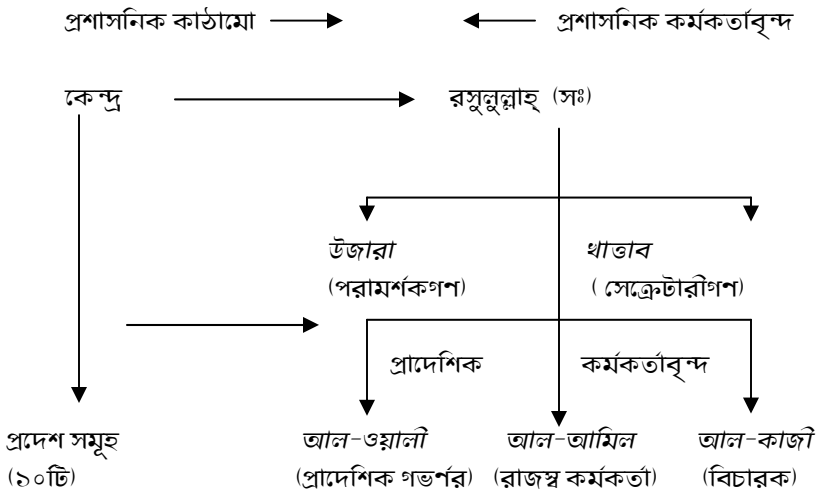

উৎসঃ Mohammad Al-Buraey, *Administrative Development: An Islamic perspective (London: KP1, Ltd., ১৯৮৫),* পৃঃ ২৪০-২৪৬ ; এবং *Journal of Islamic Admisnistration,* Vol.1. No.1, Winter ১৯৯৫, পৃঃ ১১২-১২৮।

সারণী-২

মহানবী (সঃ) এর সচিবালয়

মহানবী (সঃ) (ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি)	
দপ্তর সমূহ	**সচিবালয়** (*মস্‌জিদ-ই-নববি*) **সচিবগণ**
আল্লাহ্‌র *ওহী* (প্রত্যাদেশ) সমূহ লিপিবদ্ধকরণ।	হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) (তাঁদের অনুপস্থিতিতে উবাই-বিন-কা'ব ও জাবেদ- বিন-তাবিত)
জাকাত ও *সদ্‌কা* হতে প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণ	আল জুহাইম-বিন-আল-সাত এবং আল-জুবাইর বিন আল- আওয়া'ম
খেজুর হতে সম্ভাব্য আয়ের হিসাব তৈরী	হুদ'ইফা বিন-আল-ইয়ামন
জনগণের মধ্যকার যোগাযোগ রেকর্ড।	আল-মুগীরাহ বিন-সুআইব এবং আল-হাছান-বিন-নামির
বিভিন্ন গোত্র ও তাদের পানির হিসাব সংরক্ষণ (এছাড়াও এই দপ্তরে আনছার ,পুরুষ ও মহিলাদের-রেকর্ড রাখাহত)।	আবদুল্লাহ- বিন-আল-আরকাম এবং আলা বিন-উখবাহ্‌
রাজন্যবর্গ ও গোত্র প্রধানদের কাছে প্রেরিত চিঠির খসড়া তৈরী [ক]।	জায়েদ-বিন-তাবিত এবং আবদুল্লাহ-ইব্‌নে আল-আকরাম
রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব সংরক্ষণ	মুয়াকিব-বিন-আবি ফাতিমা
সিলমোহর সংরক্ষণ।	হানজালাহ্‌-বিন আল-রাবী

Adabiyati, ১৯৭৬), p. ১৭-১৮ এবং Dr. Muhammad Yasin Mazhar Siddique, *Organization of Government Under the Prophet (SM),* বাংলায় অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভূইঁয়া (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪)।

[ক] পরবর্তীকালে *খোলাফায়ে রা'শেদীন*-এর শাসনামলে *দিওয়ান-ই-ইনসাহ* নামে পৃথক একটি পত্র যোগাযোগ ও নথিপত্র বিভাগ সৃষ্টি করা হয় যা ছিল ইসলামী প্রশাসনের ইতিহাসে প্রথম *দিওয়ান* বা বিভাগ যার গোড়াপত্তন করেছেন স্বয়ং মহানবী (সঃ)।

১. *আল-ওয়ালী* বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা

মহানবী (সঃ) কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদীনায়। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য তিনি আরবদেশকে কতগুলো প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে *ওয়ালী* বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। *ওয়ালীগণ* প্রদেশে জনগণের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষাদান, ইসলামের প্রচার এবং আইনের

শাসন তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতেন। মদীনা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল স্বয়ং মহানবী (সঃ)-এর শাসনাধীন ছিল। মদীনা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশগুলো ছিল ঃ তাইমা, আল-জানাদ, বনুকিন্দ, মক্কা, নাজরান, ইয়েমেন, হাজরা-মাউত, উমান এবং বাহ্‌রাইন। ইব্‌নে হিশামের বর্ণনা মতে, যিয়াদ বিন্ লবিত হাজরা-মাউতের, আলী বিন্ আবু তালিব নাজরানের, মুয়ায বিন্ জাবাল ইয়েমেনের, ইয়ালা বিন্ উমাইয়া আল-জানাদের, আলা বিন্ হাযরানী বাহ্‌রাইনের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন [২০]। এছাড়াও ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান তাইমা এবং ইত্তাব ইবনে উসাইদ মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন [২১]। *ওয়ালীর* যোগ্যতা ও গুণাগুণের মধ্যে ছিল ইসলামী জ্ঞান, খোদাভীরুতা , সততা, কতর্ব্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়নিষ্ঠতা [২২]।

২. ***আল-আমিল***

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা এবং ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে, রাষ্ট্রীয় করসমূহ সুষ্ঠুভাবে আদায়ের জন্য মহানবী (সঃ) *ওয়ালী* ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল বা বড় বড় গোত্রের উপর *আমিল* নিযুক্ত করেছিলেন। *আমিলের* কাজ ছিল নির্দিষ্ট অঞ্চলের মুসলিমদের কাছ থেকে *জাকাত* ও *সাদকাহ্* এবং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী ও রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধাদি ও নিরাপত্তা ভোগকারী অমুসলিমদের নিকট থেকে *জিজিয়া কর* আদায় করা। *আমিলগণ* উন্নত চরিত্র ও ধর্মপ্রাণ সাহাবীদের মধ্য হতে নিয়োজিত হতেন।

৩. ***আল-কাজী***

রসুলুল্লাহ্ (সঃ) প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থায় তৃতীয় ধরণের কর্মচারী ছিলেন *আল-কাজী* বা বিচারক। মহানবী (সঃ) প্রদেশসমূহে *ওয়ালী* ও *আমিলদের* সাথে একজন বিচারককেও নিয়োগ প্রদান করতেন। *কাজীগণ ওয়ালী* বা প্রাদেশিক গভর্ণর থেকে স্বাধীন ছিলেন এবং সরাসরি মহানবী (সঃ)-এর নিকট রিপোর্ট করতেন। মহানবী (সঃ)-ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। তিনি মদীনার মসজিদে বসে রাজকার্যের সাথে সাথে বিচারকার্যও পর্যবেক্ষণ করতেন। বিচারক পদের জন্য যোগ্যতা ও গুণাগুণ ছিল অত্যন্ত কঠোর। বিচারকদের বিশেষভাবে *কুরআন* ও *হাদীসের ফকীহ্* বা আইনের জ্ঞানসম্পন্ন এবং একই সাথে, ধর্মীয় ও ন্যায়-বিচার করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হত। কোন কোন সময় বিচারকদেরকে গভর্ণরের দায়িত্বও প্রদান করা হত। এছাড়াও তাঁরা *ওয়াক্‌ফ* সম্পত্তি ও নাবালকের বিষয় সম্পত্তিরও দেখাশুনা করতেন। হযরত আলী (রাঃ) এবং মুয়ায ইব্‌নে জাবাল (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ রসুল
(সঃ)কর্তৃক বিচারপতি নিয়োজিত হওয়ার গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন

গ. **রাজস্ব ব্যবস্থা**

হয়রত (সঃ)-এর শাসনকালে মদীনা রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয় দেখাশুনার জন্য কোন অর্থ বিভাগ বা *ট্রেজারী* ছিলনা। রাজস্ব সংগ্রহের উৎসের মধ্যে ছিল প্রধানতঃ *জাকাত*, দান ও *সদ্‌কাহ্*। অতিরিক্ত উৎস সমূহের মধ্যে ছিল ভূমি রাজস্ব *(খারাজ)*,ভূমি কর *(ফা'ই)*, *গনিমত* ও *জিজিয়া* ইত্যাদি। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিত তুলে ধরা হল ঃ

জাকাত

ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে, কেবল সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান নাগরিকদেরকেই *জাকাত* দিতে হত। *জাকাত* শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "পবিত্রকরণ" । কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে, যে কোন ধরনের বহনযোগ্য বা স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে *(নিসাব)*[২৪] পৌঁছলে, তার উপর দেয় করকে *জাকাত* বলা হয়। সম্পদের রকমারী হিসাব অনুযায়ী, *জাকাতের* জন্য নির্দ্দিষ্ট সম্পদগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা ঃ ১) খাদ্যশস্য; ২) গৃহপালিত জন্তু ; ৩) স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু ; এবং ৪) বাণিজ্য দ্রব্য।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী, *জাকাত* হতে সংগৃহীত অর্থ আটটি খাতে ব্যয়িত হবে। এই খাতগুলো হচ্ছে ঃ ১) গরীব ও অক্ষমকে সাহায্য প্রদান; ২) অভাবগ্রস্থদের অভাব দূরীকরণ ; ৩) *জাকাত* আদায়কারী কর্মচারীদের বেতন প্রদান ; ৪) গরীব নওমুসলিমদের ভরন-পোষণ ; ৫) দাস ও বন্দী মুক্তি ; ৬) ঋণগ্রস্থের সাহায্য ; ৭) আল্লাহ্‌র পথে *জিহাদ;* এবং ৮) *মুসাফিরের* সাহায্যার্থে (যারা বিদেশ সফরে অর্থ কৃচ্ছতায় পড়ে)।

দান ও সদ্‌কাহ

দান হচ্ছে *সদ্‌কাহ্‌* ও *জাকাতের* ন্যায় দেয় সাহায্য । তবে *জাকাত* হচ্ছে অপরিহার্য, আর দান ও *সদকাহ্‌* হল ঐচ্ছিক। পবিত্র *কুরআনের* বিভিন্ন আয়াতে *জাকাত* ও *সদ্‌কাহ্‌* প্রদানের বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে [২৫]। উক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য আট শ্রেণীর প্রাপকের বিষয়েও *কুরআনে* নির্দেশনা রয়েছে। তারা হচ্ছে ঃ নিকট আত্মীয়, অনাথ ও *এতিম* শিশু, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, ভিক্ষুক, বন্দীমুক্তির জন্য দেয় পণ, *জিহাদে* অংশগ্রহণকারী এবং অভাবে সাহায্যপ্রার্থী অথচ লজ্জাবশতঃ তা প্রকাশ করেনা। দান ও *সদ্‌কাহ্‌* প্রদান সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ পূর্ণকর্ম হিসাবে প্রদেয়।

আল-খারাজ

রাজস্ব আয়ের একটি প্রধান উৎস ছিল *আল-খারাজ* বা ভূমি রাজস্ব। অমুসলিম কৃষি প্রজাদের উপর মুহাম্মদ (সঃ) এই কর ধার্য করেন। এই করের পরিমাণ ছিল ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের $\frac{১}{২}$ অংশ[২৬]। হযরত (সঃ) খায়বর বিজয়ের পর সর্বপ্রথম সেখানকার কৃষিভূমির উপর এই কর ধার্য করেন [২৭]। তথাকার ইহুদীগণ মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং *খারাজ* প্রদানের শর্তে সেখানকার কৃষিযোগ্য ভূমি চাষাবাদের অধিকার লাভ করে।

আল-ফাই

হযরত (সঃ) এর রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস ছিল *আল-ফাই* বা রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তি। বিজিত দেশের আবাদী ভূমির কতকাংশ সরাসরি রাষ্ট্রের দখলে নিয়ে নেয়া হত। ঐ সকল কৃষি ভূমিকে *আল-ফাই* বা রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তি বলা হত [২৮]। এসল সম্পত্তির আয় থেকে মহানবী (সঃ) এর আত্মীয়বর্গের ভরণ-পোষণ এবং দেশের অনাথ নারী-শিশু, গরীব-দুঃখী, পরিব্রাজক এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হত [২৯]।

গনিমত

আভিধানিক অর্থে, *গণিমত* বলতে ধন-দৌলতকে বুঝায়। কিন্তু ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক অর্থে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সম্পদকে *গণিমত* বা ইংরেজীতে booty বলা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের যে সকল মালামাল মুসলমান সৈনিকদের হস্তগত হত, সেগুলোকে একত্রিত করে $\frac{১}{৫}$ অংশ মহানবী (সঃ) তথা রাষ্ট্রের জন্য রেখে, অবশিষ্ট $\frac{৪}{৫}$ অংশ যুদ্ধে *(জেহাদে)* অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হত [৩০]।

জিজিয়া

জিজিয়া ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক সাধারণের উপর ধার্যকৃত একটি নিরাপত্তা কর। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুসারে, হযরত (সঃ) অমুসলিম প্রজার উপর এই *জিজিয়া* ধার্য করেন [৩১]। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে অমুসলিম জনসাধারণের মধ্যে যারা প্রতিরক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করতেন না, শুধু তারাই রাষ্ট্রকে এই কর প্রদান করতেন। হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর শাসনকালে এই করের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু এক *দিনার*। কিন্তু অমুসলিম ধর্মযাজক, শিশু, মহিলা, উন্মাদ ও গরীব যারা *জিজিয়া* প্রদানে অক্ষম, তারা এবং পীড়িত ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে *জিজিয়া* হতে রেয়াত দেয়া হত। *খারাজ* এবং *জিজিয়া* হতে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা হত।

ঘ. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

হযরত (সঃ) এর কোন নির্দ্দিষ্ট সামরিক বিভাগ বা নিয়মিত সৈন্য বাহিনী ছিলনা। প্রয়োজনের সময় তিনি জাতিকে আহবান করতেন। ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে উৎসাহী ব্যক্তিগণ সেচ্ছায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হতেন। এভাবে গঠিত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন মহানবী (সঃ) স্বয়ং। যোদ্ধাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, অস্ত্রে সজ্জিতকরণ এবং সমস্ত মুসলিম সৈন্যদের নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি হযরতের (সঃ) নিজের হাতে ছিল। সাধারণত তিনি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারী সর্বাধিনায়ক। কোন কোন ক্ষেত্রে এর জন্য তিনি উপনেতা নির্বাচিত করতেন। হযরত (সঃ)-এর শাসনকালে মুসলমানদেরকে বহুসংখ্যক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। তন্মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ) স্বয়ং ২৭টি যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেন এবং অবশিষ্টগুলোতে এক একজন প্রতিনিধিকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরণ করেছিলেন [৩২]।

সৈন্য বাহিনী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য বিন্যাস করার সময় পবিত্র *কুরআনের* আয়াত (৬১ঃ৪) অনুসারে *সফবন্দী*ভাবে সৈন্য সমাবেশ করা হত। প্রথম *সফে* (লাইন) বর্শাধারীগণ বাম হাঁটুতে ভর দিয়ে সামনে ঢাল নিয়ে শত্রু নিকটবর্তী হওয়ার অপেক্ষা করতেন। দ্বিতীয় লাইনে তীরন্দাজগণ পরিমাণমত দূরত্বে ব্যূহ রচনা করতেন এবং তৃতীয় লাইনে অশ্বারোহী বাহিনী সামগ্রিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সঃ) সৈন্যদিগকে *সফবন্দী* করে সাজিয়ে স্বয়ং প্রতিসারিতে প্রবেশ করে *সফ* বা লাইন সোজা করেছিলেন [৩৩]।

৬. মহানবী (সঃ)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রশাসন ব্যবস্থার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে তুলে ধরা হয়েছে তাতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠেঃ

১) ধর্ম রাষ্ট্র

মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্ম রাষ্ট্র। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আল্লাহ্র একজন *রসূল* বা প্রেরিত বার্তাবাহক কর্তৃক। তিনি পবিত্র *কুরআনের* আলোকে এর আইন-কানুনসমূহ প্রবর্তন করেন। যদিও তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তবুও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মহান প্রভূ আল্লাহ্র নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতেন। মোট কথা, উক্ত রাষ্ট্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত।

২) সমতা

মদীনা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমতা। সেখানে আইনের চোখে দেশের শাসক ও জনগণ সবাই ছিল সমান। এমন কি মহানবী (সঃ)ও একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেচিত হতেন। সমসাময়িক বিশ্বের রাজন্যবর্গ ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ ঐশ্বরিক অধিকার বা ওসসঁহরুঃ -এর যে দাবী করে থাকেন, মদীনা রাষ্ট্রে স্বয়ং মহানবী (সঃ)-এর জন্য তেমন কোন অধিকার সংরক্ষিত ছিলনা। আইনের শাসন কায়েম করতে গিয়ে তিনি নিজের আত্মীয় স্বজনকেও শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। একদা চুরির অপরাধে ধৃত সম্ভ্রান্ত মকজুমী বংশীয় ফাতিমা বিন্তে আসাদ নামীয় এক মহিলার পক্ষ হয়ে কেউ শাস্তি মওকুফের আবেদন জানালে, রসূল (সঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন, কেননা তারা একই অপরাধের জন্য দুর্বলদের শাস্তি দিত, কিন্তু ধনী ও সবলদের ছেড়ে দিত। আল্লাহ্র কসম ! ফাতিমা বিন্তে মোহাম্মদও যদি চুরির অপরাধে ধৃত হত, তাহলে তার জন্যও আমি *শরীয়া* আইনে নির্ধারিত একই ধরণের শাস্তির নির্দেশ দিতাম" *(বুখারী শরীফ)*। আধুনিক যুগে ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্রে "রাজা কোন অপরাধ করতে পারেন না" বলে স্বীকৃত অথবা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংবিধানে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতিকে আদালতে জবাবদিহি করা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৫১ (১) (২)। আবার সংসদ সদস্যদের জন্য করমুক্ত কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সুযোগ-সুবিধাও নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে তেমন কোন সুযোগ কারো জন্য সংরক্ষিত ছিলনা। তাই দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি হয়েও খলিফা হযরত আলীকে (রাঃ) একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় কাজীর দরবারে উপস্থিত হতে হয়েছিল ন্যায়বিচারের প্রার্থী হিসাবে। অনুরূপভাবে, খলীফা ওমর (রাঃ) কেও জুম্মার প্রকাশ্য সমাবেশে জবাবদিহি করতে হয়েছে সমতার ভিত্তিতে *বায়তুল মালের* সম্পদ বিতরণ সম্পর্কিত প্রশ্নের। কেবল ধর্মভীরুতা ও সৎকর্ম এবং উন্নত চরিত্র ও *শরীয়ত* সম্বন্ধে পান্ডিত্যই ছিল সেখানে মানুষের মান ও মর্যাদা নির্ধারণের মাপকাঠি। উক্ত রাষ্ট্রে আরব-অনারব, সাদা-কালো, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ তথা বর্ণবাদের কোন স্বীকৃতি ছিলনা। হযরত (সঃ) বলেছেন, "কোন নাককাটা কাল কাফ্রীও যদি স্বীয় যোগ্যতাবলে তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয়, তবে তোমরা তাঁকে মান্য কর" *(আল-হাদীস)*।

৩) শ্রম বিভাজন

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সংগঠিতকরণের নীতি অনুযায়ী, শ্রম বিভাজন (উরারংরড়হ ড়ভ ড়ড়ৎশ) অপরিহার্য। মদীনা রাষ্ট্রেও দেখা যায় যে, হযরত (সঃ) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য *ওয়ালী, আমিল, কাজী, মুহ্তাসিব* ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করেছিলেন। এতে হযরত (সঃ)-এর প্রশাসন পরিচালনায় শ্রমবিভাজন নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

৪) প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার উপর গুরুত্ব আরোপ

মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের ভিত্তি ছিল **মেধা** ও যোগ্যতা। তথায় স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের কোন সুযোগ ছিল না। মদীনা রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হিসাবে মহানবী (সঃ) প্রথমে গড়ে তুলেছিলেন একদল আদর্শবান মানুষ। ধর্মপরায়নতার সাথে সাথে, তাদের সততা ও নেতৃত্বের যোগ্যতাও বিকশিত হয় সমভাবে। এদেরকেই নিয়োগ দান করা হয় বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে। সরকারী কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে পবিত্র *কুরআনের* নির্দেশ হচ্ছে, "(কর্মচারী) হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে 'শক্তিশালী' এবং 'বিশ্বস্ত' (*সূরা কাসাস*,২৮ঃ২৬)। নিয়োগের সময় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বাদ দিয়ে স্বজনপ্রীতির আশ্রয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "যে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কারো বদলে কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করল, সে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল" (*ইব্নে তাইমিয়া*)।

৫) পদসোপান নীতি

মহানবীর (সঃ) প্রশাসন ছিল **পদসোপান** নির্ভর। আল্লাহ্র আইন বা *কুরআনের* নির্দেশাবলীকে শিরোধার্য করে প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেছেন স্বয়ং রসুল (সঃ)। তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীলগণ কর্মরত থাকতেন। পবিত্র *কুরআনে* আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, *আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রসুলু, ওয়া উলিল আমরে বাইনাকুম,* অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, মান্য কর রাসুলকে এবং নেতৃত্ব মেনে চল তাঁদের যাদেরকে তোমাদের মধ্য হতে ক্ষমতাসীন করা হয়েছে' [৩৭]। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন পদসোপান ভিত্তিক হলেও এর কার্যক্রম আনুভূমিক (ঐড়ৎব্লুড়হঃধষ) পর্যায়েও বিস্তৃত ছিল।

৬) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে *শুরা* বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। *কোরআনের* নির্দেশ হচ্ছে, *ওয়া আমরুহুম শু'রা বাইনাহুম* অর্থাৎ 'তোমরা নিজেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন কর আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে'[৩৮]।মদীনা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। যদিও মহানবী (সঃ) ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্র সর্বময় নেতা এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁর আদেশ বিনা বাক্যে মেনে চলতেন, তথাপি তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ ও মত বিনিময় করতেন। উদাহরণস্বরূপ, বদরের যুদ্ধের সময় রসূল (সঃ) প্রথমদিকে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে বদরের প্রান্তরে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাবু খাটানোর নির্দেশ প্রদান করেন। বিষয়টি চূড়ান্তকরণ নিয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শের সময় জনৈক সাহাবা ভিন্নতর জায়গায় যেখানে পানির ফোয়ারা অবস্থিত, তথায় সেনা ছাউনী সরিয়ে নেবার পরামর্শ দেন যাতে শত্রুপক্ষ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। পরার্মশটি যুক্তিসঙ্গত মনে হওয়ায় এবং এর উপকারিতা বিবেচনা করে রসুল (সঃ) তা গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে তাদের ছাউনী পানির ফোয়ারার পার্শ্ববর্তী স্থানে সরিয়ে নেবার নির্দেশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে, ওহুদের যুদ্ধের সময়ও অধিকাংশ সাহাবার মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে রসুল (সঃ) তাঁর নিজস্ব মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও মদীনা নগরীর বাইরে গিয়ে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মহানবী (সঃ)-কে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য *উজারা* (মন্ত্রীবর্গ) এবং *খাত্তাব* (সেক্রেটারীগণ) ছাড়াও ছিলেন প্রিয় সহচর বা সাহাবীগণ। হযরত (সঃ) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এভাবে ইসলামী প্রশাসনে জনগণের অধিকার ও অংশগ্রহণ হয়েছিল কার্যত স্বীকৃত। এমনকি, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে অমুসলিমদের সাথেও পরামর্শ করার নজির রয়েছে ।

৭) সামাজিক ন্যায়বিচার

আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী শান্তি ও ন্যায়বিচারের মহান আদর্শই ছিল মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহ্ ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আদেশ করেছেন। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় রাজা-প্রজা , মুসলমান-অমুসলমান, আরব -অনারব, আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং উচ্চ-নীচ কোন ভেদাভেদ ছিলনা। আল্লাহ্ বলেন, *কুল আমারা রাব্বি বিল কিসতে* অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ) বলুন, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার' [৩৯]। অন্যত্র বলা হয়েছে, *ওয়া ইজা হাকামতুম বাইনান্নাসি আন তাহকুমু বিল আদল্* অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র আদেশ হচ্ছে যখন বিচার করবে তখন ন্যায় বিচার করবে' [৪০]। আরো বলা হয়েছে, *ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আ'মানু কু'নু কাওয়ামিনা বিল কিস্‌তে শুহাদায়া লিল্লাহি ওয়ালও আ'লা আনফুসিকুম আওউল ওয়ালিদাইনে ওয়াল আকরাবিনা ফালা তাত্তাবিয়ুল হাওয়া আন তা'দিলু* অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারী গণ ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানকারী ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও। যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয় এবং ন্যায়বিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা' [৪১]। তাই আমরা দেখতে পাই যে, মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবী (সঃ) নিজেও সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং ইসলামী আইন-কানুনে অভিজ্ঞ, সৎ, খোদাভীরু ও নিঃস্বার্থপর ন্যায়বান ব্যক্তিদেরকে প্রশাসক ও *কাজী* পদে নিয়োগ প্রদান করেছিলেন।

৮· প্রশাসনিক জবাবদিহিতা

প্রাদেশিক কর্মকর্তাগণ অর্থাৎ *ওয়ালী, আমিল* এবং *কাজী* তাঁদের কাজের জন্য সরাসরি রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) নিকট দায়ী থাকতেন। হযরত (সঃ) প্রদেশ সমূহের রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয় তদারকির জন্য জবাবদিহি এবং ভারসাম্য (ঈযবপশং্ ইধষধহপব) নীতি রক্ষা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, একদা এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য *আমিল* পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ঐ *আমিল* রাজস্ব আদায় করে মদীনায় এসে বললেন, রাজস্বের কিছু অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি তাকে উপহার হিসাবে দিয়েছে। তা' শুনে হযরত (সঃ) বলেছিলেন, "সে ব্যক্তির কতই না ভুল ধারণা যাকে আমরা রাজস্ব আদায়ের জন্য নিয়োগ করেছিলাম অথচ সে এসে বলছে, 'এ অংশ আপনাদের জন্য ও ঐ অংশ আমাকে দেয়া হয়েছে'। যদি সে ব্যক্তি তার পিতামাতার ঘরে বসে থাকত, তাহলে কি তাকে কোন কিছু দেয়া হত [৩৪]?" হযরত (সঃ) আরো বলেন, "যখন কোন ব্যক্তিকে আমরা কোন কাজে নিয়ুক্ত করি, তখন তাকে আমরা বেতন ভাতাও দিয়ে থাকি। যদি কেউ এর পরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা নিয়ে থাকে, তবে তা হবে বিশ্বাস ভঙ্গের নামান্তর [৩৫]।

এছাড়াও সামাজিক অনাচার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অসাধুতা প্রতিরোধ এবং প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা থেকে নাগরিকদের রক্ষার জন্য কালক্রমে *আল হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক) এবং *দিওয়ান-আল- মাজালিম* (অভিযোগ তদন্ত কারী) নামে দু'টি প্রতিষ্ঠানেরও প্রবর্তন করা হয়েছিল [৩৬]।

৯) মানবতার বিকাশ

মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতা বিকাশের এক নতুন সংস্থা। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের ভিত্তিতে মানব সমাজ ছিল বহধা বিভক্ত, সেখানে তিনি বৃহত্তর মানব কল্যাণের লক্ষ্যে এমন এক রাজনৈতিক কাঠামো রচনা করেন যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি বজায় রেখেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সাথে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষত্ব এখানেই। আধুনিক যুগে অনেকেই মনে করেন, 'ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে শুধু ইসলামী *শরীয়তের* রূপায়ন ক্ষেত্র। শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব , জাকাত, হিজাব, বিয়ে-তালাক, চুরির শাস্তি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত ইসলামী বিধানই এখানে কয়েম হবে'। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের দিগন্ত বহু প্রসারিত। বিভিন্ন ধর্ম ও মতের অনুসারীগণ কিভাবে একই রাষ্ট্রে মিলে মিশে বসবাস করতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র হবে তারই সফল দৃষ্টান্তস্থল। অন্যভাবে বলতে গেলে, উদার মানবতা ও বিশ্ববোধই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল প্রেরণা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় *শরীয়তের* যে কঠোরতা সম্ভব, ইসলামী রাষ্ট্রে বরং তা অনেকাংশে শিথিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী সমাজে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের জন্য মূর্তিপূজা শুধু অনুমোদিতই নয়, বরং বিভিন্নভাবে অমুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জান-মালের নিরাপত্তা এবং সরকারী প্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকার ও সুযোগ সংরক্ষিত [৪২]।

১০) অমুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণ

অমুসমানদের সাথে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ চুক্তি ও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করাটা ছিল মদীনা রাষ্ট্রের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মহানবী (সঃ) *জিজিয়ার* (নিরাপত্তা কর) বিনিময়ে অমুসলিমদের সাথে যে সকল মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তার মূল বিষয়বস্তু ছিল ঃ

ক) তারা (অর্থাৎ অমুসলিমগণ) শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে মুসলমানরা তাদের রক্ষা করবে ;

খ) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না ;

গ) তাদেরকে সকল প্রকার নিরাপত্তা দেয়া হবে ;

ঘ) তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পত্তি অধিকারের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে ;

ঙ) তাদের ধর্ম, ধর্মস্থান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গীর্জাদির কোন ক্ষতি করা হবে না বা ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করা হবে না ;

চ) তাদের কোন নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে না ;

ছ) তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে না বা সামরিক বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হবেনা ; এবং

জ) ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে [৪৩]।

বস্তুতঃ মদীনারাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের জান-মাল ও ধর্ম পালনে নিরাপত্তা প্রদান এবং তাঁদের সাথে ন্যায়বিচারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (সঃ) বলেন, "যাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, কেউ যদি তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে কিংবা তাদের উপর বহন করার অতিরিক্ত বোঝা (কর) চাপায়, তবে আমি শেষ বিচারের দিনে তাদের জিম্মার পক্ষে ওকালতি করব" [৪৪]।

১১) মহানবী (সঃ) এর সাংগঠনিক নেতৃত্ব

হযরত (সঃ) এর রাষ্ট্র তথা প্রশাসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তা হচ্ছে, তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী। ওয়েবারীয় ধারণামতে তিনি কোন গতানুগতিক (ঐৎধফরঃরড়হধষ) নেতা ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে Al Buraey বলেন, " He did not assert the right to rule and lead by virtue of his birth or class " [৪৫]। পবিত্র *কুরআনের* ঘোষণা অনুযায়ী, হযরত (সঃ)-কে কেবলমাত্র আরব জাতির জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য *রসুল* বা আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, *ওয়ামা আরছলনাকা ইল্লা কা'ফফতান লিন্নাসে বশীরাউ ওয়ানজিরা* অর্থাৎ আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে [৪৬]। তাঁর ভেতর ছিল সহজাত নেতার শাশ্বত সকল গুণাবলী। অতএব, তাঁকে আধ্যাত্মিক (Charismatic) ও আইনগত (Legal) নেতা হিসাবে বিবেচনা করা যায়। তিনি তাঁর মিশনের প্রাথমিক অবস্থায় অনুসারীদেরকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকান্ডে উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতার দ্বারা পরিচালিত করেছিলেন। একারণে সারা বিশ্বের মুসলমান হযরত (সঃ)-কে তাদের পথ প্রদর্শক, পরিচালক ও নেতা হিসাবে বিবেচনা করে এবং তার ইন্তেকালের প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পরও তাঁর পথ অনুসরণে ও তাঁর নির্দেশ পালনে সচেষ্ট। একজন মহান নেতা হিসাবে হযরত (সঃ)-এর দক্ষতার কথা বহু লেখক বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছেন। তাঁর সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক সামর্থের বর্ণনা দিতে গিয়ে Williarm Hocking বলেন, "মুহাম্মদ (সঃ) এর চিন্তা ও কাজের মধ্যে ছিল অভিন্নতা এবং এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর শাসন ব্যবস্থা। তিনি একদিকে ছিলেন আল্লাহ্‌র রসুল এবং অন্যদিকে ছিলেন আইন প্রণেতা ও *ম্যাজিষ্ট্রেট*" [৪৭]। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মুহাম্মদ (সঃ) ইসলামী *কমনওয়েলথের* প্রধান হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে আরবজাতির চরিত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বদা কলহ-বিবাদে লিপ্ত দল ও গোত্রসমূহের মধ্যে, এক মহান আদর্শের প্রভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় সাফল্য অর্জন ইতিহাসে নজীর হিসাবে চির অম্লান থাকবে" [৪৮]। তাঁর এই মহান আদর্শের প্রভাব সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এখনও সমানভাবে বিরাজিত রয়েছে। আর এজন্যই Michael H. Hart বিশ্বে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ১০০ জন ব্যক্তির মধ্যে হযরত (সঃ)-কে সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " He was the only man in history,who was supremely successful on both religious and secular levels " [৪৯]।

১২) তত্ত্ব ও প্রয়োগের বাস্তব নিদর্শন

চূড়ান্তভাবে বলতে গেলে, হযরত (সঃ) মদীনা রাষ্ট্রে সরকার ও প্রশাসনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের এক মহান দলীল ভান্ডার সৃজন করেছেন যা ছয়টি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থে *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ* ও

নাসাঈ শরীফ) লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর অনেক নির্দেশনা ও কথায় প্রশাসনের মৌলিক নীতিমালা, ন্যায়বিচার এবং দক্ষতার কথা প্রতিভাত হয়েছে। অধিকন্তু , আধুনিক প্রশাসনের ধারণা অনুযায়ী, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব যে পরস্পর নির্ভরশীল, তা আজ থেকে ১৪০০ বৎসর আগে রসুল (সঃ)-এর অনেক *হাদীসে* প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ)-এর একটি *হাদীস* হচ্ছে, "তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে মন্দকাজ করতে দেখ, তবে সে যেন তাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করে। আর যদি সে তাতেও অপারগ হয়, তবে সে যেন অন্তর দ্বারা পরিবর্তন কামনা করে। তবে এটি হবে ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক" [৫০]।

চ) উপসংহার

রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে যদিও আধুনিক রাষ্ট্রের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রশাসন যন্ত্র ছিলনা, তথাপি সে সময়ের প্রেক্ষিতে মহানবী (সঃ)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার যথার্থতা ছিল সন্দেহাতীত। *শরীয়া* নীতির উপর ভিত্তি করেই এ ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং যার ব্যাপক ভিত্তি ছিল ব্যক্তির মানবিক গুণাবলী যথা,সততা, ন্যায়বোধ ও সহানুভূতি। এ প্রসঙ্গে আধুনিক লোক-প্রশাসন চিন্তাধারায় সাম্প্রতিক ধারণার প্রবক্তা আরব লোক-প্রশাসনবিদ আবদেল হাদী বলেন, হযরত (সঃ)-এর সময়ের প্রশাসনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। মহানবী (সঃ) পৃথিবীতে এক মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সে কারণে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও একটি মহান উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্য হল ইসলাম ও এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করা। তিনি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কার্যাবলীকে পৃথকভাবে দেখেন নাই, বরং একের সঙ্গে অপরকে সম্পর্কযুক্ত করে মানুষকে মহান হবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সমাজে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত কর্তৃত্বের সংরক্ষক ও পরিচালক। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছিলেন নিজ নিজ প্রশাসনিক দায়িত্ব। সে কারণে মদীনা রাষ্ট্রকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রও বলা যেতে পারে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে আমীর হাসান সিদ্দিকী মদীনা রাষ্ট্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

" It was a unique welfare state ever designed by mankind "[৫১]। অতএব, মহানবী (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্র ও তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমাদেরকে চৌদ্দশত বৎসর পরও পথের দিশারী হিসাবে পথের নির্দেশনা দেয়। বর্তমানে "নব লোক-প্রশাসনের" ধারণায় যে সাম্য, ন্যায়বিচার ও দরিদ্রের জন্য সহানুভূতির কথা বলা হচ্ছে, তার প্রতিফলন আমরা মদীনা রাষ্ট্রেই দেখতে পাই। আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকর্মে আল্লাহ্র *কোরআন* ও রসুলের (সঃ) *সুন্নাহ* অর্থাৎ ইসলামের নীতিমালার প্রয়োগ উপযোগিতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনাধীন ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুসারী হওয়ার কারণে, নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির কার্যকারিতার ব্যাপারে আস্থাহারা বা সন্দেহপ্রবণ আরবের একটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পুণর্গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে সমসাময়িক কালের দু'জন লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। Luther Gulick Ges James Pollock নামক আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই দু'জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ১৯৬২ সালে প্রদত্ত তাদের রিপোর্টে লিখেছেনঃ

" Islamic culture is one of the best bases for a strong and succesful government and a strong and efficient bureaucracy in modern times" অর্থাৎ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে আধুনিক সময়ে একটি শক্তিশালী সরকার এবং সুদক্ষ আমলাতন্ত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি [৫২]। তারা আরো লিখেছেন, " The *Shari'ah* offers the Egyptians (so to all Muslim countries) the basic principles and elements upon which they can erect their new democracy and use their leadership qualities, citizens' involvement in the political life of the country and participation in the administrative machinery in the best interest of the nation as a whole " অর্থাৎ ইসলামী *শরীয়া (কোরান, সুন্নাহ* ও *ইজতেহাদ)* মিশরীয়দেরকে (অতএব সকল মুসলিম দেশসমূহকে) তাদের নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা প্রদান এবং জাতির সার্বিক স্বার্থে নেতৃত্বের গুণাবলীর যথাযথ ব্যবহার ও দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে [৫৩]। কোন মৌলবাদী মুসলিম গবেষক নয়, বরং বিশ্ব বরেণ্য পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের এ সকল উক্তি বিশ্বের নবজাগরিত মুসলিম জাতিসমূহকে হীনমন্যতা পরিহার এবং আত্মবিশ্বাসী হতে অনুপ্রাণিত করবে--এটাই প্রত্যাশিত।

তথ্যপঞ্জী

১. মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭),পৃঃ ৮৭।

২. *মাসিক পৃথিবী*, আগষ্ট ১৯৯৫, পৃঃ৭।

৩. ড.মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *মহানবী (সঃ)-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা*, আ.ক.ম.আব্দুল কাদের অনুদিত (চট্টগ্রাম ঃ শাহীন একাডেমী,১৯৯০),পৃঃ ৪৫,উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপক আবদুন নূর, " ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ম কাঠামো," *মনাযিল*, ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ, ১৯৯১,পৃঃ ১৭।

৪. Muhammad Al Buraey, *Administrative Development : An Islamic Perspective* (London : KP1,১৯৮৫),p.২৪০.

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪১।

৬. আবদুল করিম, "কিতাবুর রসূল" (ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সংবিধান), আব্দুল করিম সম্পাদিত, *ইসলামী ঐতিহ্য*, জুন ১৯৮৫,বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পৃঃ ১।

৭. Muhammad Al-Buraey, *প্রাগুক্ত*,পৃঃ ২৪২।

৮. ড.মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ , *আহাদে নববী মে নেজামে হুকুমরানী*, পৃঃ৩৩।

৯. গোলাম মোস্তাফা, *বিশ্বনবী* (ঢাকাঃ ১৯৪২), পৃঃ১৪৭।

১০. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৫

১১. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (London : Cambridge University Press, ১৯৭৯),p.২৭৫.

১২. S.A.Q. Husaini, *Constitution of the Arab Empire* (Lahore : Shaikh Muhammad Ashraf, ১৯৫৮), p.২-৪.

১৩. Mahammad Al-Buraey, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৩।

১৪. *আল-কুরআন* (৩ ঃ ১৮৯)।

১৫. ***De Republica*, p.** ৩২ ।

১৬. ***Lecture on Jurisprudence* (London : 1802) p.88.**

17. ***Leviathan*, Everyman's Library Series, p.12**

18. *প্রাগুক্ত*, মুখবন্ধ।

19. **S.A.Q. Hussaini,** *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯।

20. ইবনে হিশাম, *সীরাতুন্নবী (সঃ)*, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৯৬৫।

21. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *মহানবীর সচিবালয়* (ঢাকা ঃ নূর প্রকাশনী, ১৯৮৫)পৃঃ ২২।

22. **Muhammad Al-Buraey,** *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৪।

23. *প্রাগুক্ত* , মুখবন্ধ।

24. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আল মাওয়ার্দী, *আহকামুস সুলতানিয়া*, পৃঃ ৩৯৯,উদ্ধৃত করেছেন ডঃ মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান, শেখ লুৎফুর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ* (রাজশাহী ঃ বুকস প্যাভিলিয়ন, ১৯১৯), পৃঃ ৩৩।

25. *আল-কুরআন* (২ ঃ ৪০, ৭৭ ; এবং ৯ঃ ৫) ।

26. বালাযুরী, *ফতুহ আল বুলদান* (*লাইদেন*, ১৮৬৬),পৃঃ ২৭ ।

27. আল মাওয়ার্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬৬।

28. আবু ইউসুফ "বাব আল গানীমত," *কিতাবুল খারাজ*, পৃঃ ১১।

29. বালাযূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯।

30. আল-মাওয়ার্দী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৭-২৪৫।

31. *আল-কুরআন* (৯ঃ ২৯)।

32. ইবনে হিশাম ও আল ওয়াকিদী অবলম্বনে তালিকা, উদ্ধৃত করেছেন **M. Watt,** ***Muhammad at Medina,*** পৃঃ ৩৩৯-৪৩।
33. ইবনে হিশাম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৪৪।
34. উদ্ধৃত করেছেন **Muhammad Al-Buraey**, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪৫।
35. *আবু দাউদ শরীফ* (১৯৬৩ ঃ ৬২৬), ঐ, পৃঃ ২৪৫।
36. **Muhammad Al-Buraey,** *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৫৭-২৬৪।
37. *আল-কুরআন* (৪ঃ ৫৯)।
38. *ঐ* (৪২ঃ৩৮)।
39. *ঐ* (৭ ঃ ২৭)।
40. *ঐ* (৪ ঃ ৫৮)।
41. *ঐ* (৪ ঃ ১৩৫)।
42. গোলাম মোস্তাফা, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৪৯।
43. ড.মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও শেখ লুৎফুর রহমান,*মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পৃঃ ৪৩।
44. আমীর হাসান কর্তৃক উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৩।
45. **Muhammad Al-Buraey,** *প্রাগুক্ত,* পৃ ২৪৬।
46. *আল-কুরআন* (৩৪ঃ ২৭)।
47. **Muhammad Al-Buraey,** *প্রাগুক্ত,* পৃ ২৪৩।
48. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪৩।
49. **Michael. H. Hart,*The 100 : A Ranking of the Most Influential Persons in the History* (New York : Hart Publising , 1978), p.33**
50. *আল নব্বীর চল্লিশ হাদীস*, ১৯৭৭ ঃ ১১০, উদ্ধৃত করেছেন **Mahammad Al-Buraey** *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪৭।
51. *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ,* পৃঃ ৪৪।
52. উদ্ধৃত করেছেন আবদুন নূর, "ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ম কাঠামো" *মনাযিল*, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, ১৯৯১, পৃঃ ১৮।
53. *ঐ*।

O ye who believe ! Be firm in justice... even in cases against yourself, your parents or your kindred, whether the case pertain to a rich man or a poor man so follow not your passion least you lapse from truth Allah is every informed of what ye do.

-Al-Qur'an (4:135)

And do not let hatred by any people dissuade you from dealing justly. Deal justly, for that is closer to Godliness.

-Al-Qur'an (৫:৮)